ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রত্যপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু -৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ভিতরের পাতায়
১) কর্ম ও জীবন ঃ
বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
২) ভারততত্ত্ববিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য
৩) বিজ্ঞান মনস্কতা
৪) হিরোসিমা দিবস
৫) বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বর্ষ-১১ সংখ্যা - ৪ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০১৪ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

বিশ্বের বৃহত্তম ফুল

ফুল কিন্তু সাধারণ নয়

ফুল শব্দটির মধ্যে রয়েছে সুপ্ত এক কমনীয় সৌন্দর্য আর অপরূপ বর্ণসুষমা। মানব জীবনে ফুল এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। জন্মের শুরু থেকে বিদায়ের লগ্ন পর্যন্ত ফুল অপরিহার্য। ফুলের মাধুর্য সুগন্ধ আর রঙের বৈচিত্র্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। এমন ফুলও যে যুগপৎ মানুষকে আশ্চর্য করে, বিকর্ষণও করে। এরকম দুটি ফুলের নাম হচ্ছে র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডী আর টাইটান অরাম। প্রথমটির আলোচনায় প্রথমে আসি।

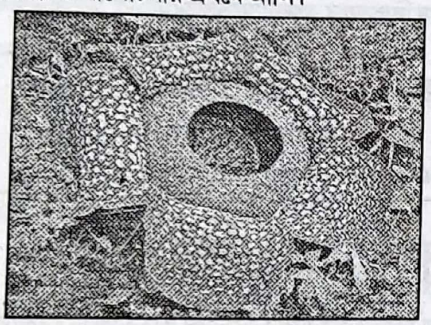

বিশ্বের বৃহত্তম ফুল র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডী

র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডী উদ্ভিদটির পুষ্পের অতিকায়ত্ব ও উদ্ভিদ দেহের অত্যাধিক হ্রস্বতা উদ্ভিদবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহু আগে। পরজীবীতা জীববিজ্ঞানের একটি সাধারণ ঘটনা। পরজীবীদের ক্ষেত্রে কিছু শারীরবৃত্তীয়

এরপর 2 পাতায়

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী

কোবরা ও ভারত

কেউটে ঃ বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের 'Naja naja kaouthia' নামে ডাকা হয়। বাংলায় এদের কেউটে, কেউটিয়া, ফনাক, পদ্মকেউটে, দুধরাজ, আলকেউটে, কালকেউটে, গোঁড়া, গেঁড়ি কেউটে প্রভৃতি নামে, ইংরাজিতে Indian Cobra, Bengal Cobra, Monocellate Cobra প্রভৃতি নামে এদের ডাকা হয়।

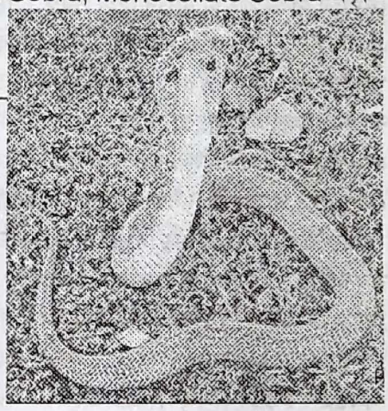

কেউটে চিনবেন কেমন করে?

দৈর্ঘ্যে ৩ -৪ ফুট লম্বা হয়। দেহের রং কালচে, গাঢ় খয়েরি, ধূসর হলুদ এবং ছাই রঙের হয়। সারা দেহে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট ফুটকির দাগ বা চেকের প্যাটার্ন উপস্থিত। দেখতে গোখরোর মতই তবে এদের ফনায় থাকে ১টি গোলাকার বা বরফির মতো দাগ। কখনও মাথার দুধারে দুটি সমান আকৃতির একটি করে মোট দুটি কালো দাগ রয়েছে। কখনও কখনও তিনটি গোলদাগ, যার মধ্যে মাঝের দাগটি অপেক্ষাকৃত বড় মাথায় লম্বালম্বি ভাবে বা আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত থাকে। অনেক সময় মাথায়

এরপর 3 পাতায়

সমাজ শিক্ষক উইপোকা

"উই আর ইদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা করে কেটে ছারখার।"

আসুন এবার দেখা যাক 'উই'-এর ব্যবহার সত্যি সত্যিই এমন ন্যক্কারজনক কিনা!

মানুষের ভারি গর্ব যে, সে সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের নিয়মকানুন, আদবকায়দা সবই মেনে চলে, কিন্তু প্রকৃত দলগত ও সামাজিক ঐক্য মানুষের মধ্যে কতটুকুই বা আছে - যা আছে পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী 'উইপোকা'দের মধ্যে?

আপনারা হয়তঅনেকেই জানেন দলগত ঐক্যের দিক থেকে পতঙ্গ শ্রেণীর কিছু কিছু প্রাণী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। এমনই একটি দলবদ্ধ সামাজিক পতঙ্গ হল আমাদের সবার

এরপর 4 পাতায়

পাখিদের কথা

মুনিয়া (White - Rumped Munia) *Lonchura striata*

আকার ঃ- ১০ থেকে ১১ সেমি দৈর্ঘ্য অথবা চড়ুই পাখির সমতুল।

বর্ণনা ঃ- ধুসর-রুপালি রঙের মোটা, ছোট ঠোঁট। শরীরের উপরের অংশ এবং বুক ঘন বাদামি রঙের। পেট আর "রাম্প" (পিঠের শেষের অংশ) সাদা। শরীরের তুলনায় লেজ যথেষ্ট লম্বা এবং প্রান্তটি তীক্ষ্ন। স্ত্রী-

মুনিয়া

এরপর 4 পাতায়

ফুল কিন্তু সাধারণ নয়

1 পাতার পর

গঠনগত পরিবর্তণ ঘটে থাকে। সমস্ত পরজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে র‍্যাফ্লেসিয়া গোত্রের পরজীবীত্বের পরিবর্তন উদ্ভিদবিদদের যথেষ্ট আগ্রহের উদ্রেক করে। র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডীকে পরজীবীদের রাজ্ঞী অর্থাৎ (Queen of Parasite) বলে অভিহিত করা হয়। পুষ্পটি অদ্ভুতদর্শণ। এটি পূর্ণমূলপরজীবী। জাভার Bogor Botanical Gargen এ বীজ থেকে বুঁড়ি বার হতে সময় লেগেছিল দেড় বছর আর ফুলটির স্থায়ীত্ব কাল ছিল সম্ভবতঃ মেটে ২-৩ দিন। এরপরে ফুলটির পচন শুরু হয়। ১৮১৮ সালে র‍্যাফ্লেসিয়া আবিষ্কৃত হয় সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়ার নিরক্ষীয় বনভূমিতে। এই সময়ের জাভার লেফটেন্যান্টগর্ভনর স্যার টমাস স্ট্যামফেড র‍্যাফ্লেস (১৭৮১-১৮২৬) এবং প্রথিত যশা ডঃ যোসেফ্ আরনল্ড দ্বারা এই আবিষ্কার উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। বিখ্যাত ইংরেজ উদ্ভিদবিদ রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) আবিষ্কারকদের সম্মান জানিয়ে এই উদ্ভিদের নামকরণ করেন র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডী। এই উদ্ভিদের অস্বাভাবিক ফুলটি বেরিয়ে আসে রোহিনী জাতীয় উদ্ভিদ থেকে যেখানে কোন পত্র বা মূলের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। স্থানীয় লোকেরা একে ক্রুবাট (Krubut) বা মস্ত বড় ফুল বলে অভিহিত করে। মূলহীন পত্রহীন দেহ কল্পনাতীত! সমস্ত উদ্ভিদটির সুতোর মত শোষক মূল ও অন্যান্য কলাতন্ত্র ফুলটির দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। পরিণত পুষ্পের আয়তন সাধারণতঃ ৫০-৭০ সেমি ব্যাস যুক্ত। বৃহত্তম র‍্যাফ্লেসিয়ার আয়তন ৯০ সেমি বা তারও বেশি হতে পারে। ২০০৭ সালের জানুয়ারির টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটি সংবাদে জানা গেছে হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্ চার্লস ডেভিস ও তাঁর সহকর্মীরা এই দৈত্যাকৃতি ফুলের বংশানু বা জিন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষা করে দেখেছেন এই ফুলের নিকটবর্তী সম্পর্কের পরিবারের আয়তন মাত্র কয়েক মিলিমিটারের মত হয়ে থাকে। বৃহৎ র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডীকে দেখে মনে হয় এ যেন গ্রহবর্হিভূত কোন ফুল। এর নাটকীয় বৃদ্ধি অবাক করে। একে ক্যারিয়ন মিমিক বলে কারণ রক্তের মত রাঙা র‍্যাফ্লেসিয়া পচা মাংসের গন্ধযুক্ত। এই উদ্ভিদ যে গোত্রের তা থেকে ক্যাস্টর অয়েল, রাবার প্রভৃতি তৈরী হয়। পচা মাংসের মাছি, মথ পরাগ সংযোগে সাহায্য করে। উদ্ভিদ জগতের এক বিস্ময় এই পুষ্প। ডেভিস ও তাঁর সহযোগিরা এর জিনোমের প্রতি বা এই প্রজাতির নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমোজোম সর্ম্পকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এর পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠার জন্যই এর জিনের অনুসন্ধান। র‍্যাফ্লেসিয়ার ফটোসিন্থেটিক জিন নেই। অবশ্য সেই কারণেই পরজীবী। পঞ্চাশ রকম প্রজাতির র‍্যাফ্লেসিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ছাড়া থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া আর ফিলিপাইন দীপপুঞ্জ এদের বাসভূমি।

এই রকম আর একটি বৃহৎ ফুলের নাম হচ্ছে টাইটান অরাম। এর বিজ্ঞান সম্মত নাম অ্যামারোফেলাস টাইটেনিয়াম। টাইটান অরাম ২ দিন ধরে দেখা গিয়েছিল বসিরহাটের পশ্চিম দন্ডিরহাটে। এর পাপড়িগুলি প্রায় দেড় ফুট। ইন্দোনেশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান জলাভূমিতে এটি জন্মায়। মাটির নীচের মস্তটিউবার থেকে এই যৌগিক মঞ্জরী পুষ্পটির জন্ম। এই টিউবার খাদ্য সংগ্রাহক ও খাদ্য সংরক্ষক। টানটান অরামের পত্রটি শুকিয়ে যায় অপর পাতা জন্মানর আগে। ঐ জায়গায় বেরিয়ে আসে মঞ্জরী দন্ড। ঐ মঞ্জরী দন্ড অদ্ভুত মজায় প্রতিদিন ১০ সেমি করে বেড়ে ওঠে। পুষ্পাধারটি সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে মেলে ধরে। পুষ্প দন্ডের নীচের দিকে স্ত্রীপুষ্প, মধ্যিখানে কাব পুষ্প এবং উপরের দিকে জন্ম নেয় পুরুষ ফুল। অগ্রভাগের পুষ্পহীন অংশ হল অ্যাপেনডিক্স। টাইটান অরামের পত্রটি বিশাল, বিভক্ত ছাতার মত বা সামিয়ানা অথবা চাঁদোয়ার মত। এই পত্র এতই দীর্ঘ যে সাত মিটার দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ায় এই ফুলের নাম বাঙ্গে বাঙ্কাই (Bunge Bankai) অথবা কার্পস ফ্লাওয়ার বা ক্রান্তীয় বনভূমিতে কোরক আর্বিভূত হয় এবং তার থেকে পুষ্পিত উদ্ভিদ। পুষ্পাধারটি থেকে উত্তাপ নির্গত হয়। প্রথমে স্ত্রীপুষ্প বৃদ্ধিপায়, পরে পুরুষ ফুল। এই কারণে এখানে স্বপরাগ যোগ হয় না। পুরুষ পুষ্প পরাগ নির্গত হয় এবং স্ত্রী পুষ্পে পতিত হয় অর্থাৎ বিপরীত পরাগ সংযোগ ঘটে। এই ফুলের পচা মাংসের গন্ধমাছিদের অথবা মথকে অনেক দূর থেকে আকৃষ্ট করে। পুরুষ পুষ্পের পরাগ বহন করে স্ত্রীপুষ্পে বসায় পরাগ সংযোগ ঘটে এবং নিষিক্ত করণ বা ফার্টিলাইজেসান হয়। মঞ্জরীদন্ডের উপরের উদগত অংশ অ্যাপেন্ডিক্স শুকিয়ে যেতে শুরু করে। ফুল ফলে পরিণত হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণের বেরী জাতীয় ফল গঠিত হয়। এই ফল অলিভ সাইজের বনভূমির মাটিতে পতিত হলে, হর্নবিল জতীয় পাখী এই ফল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ও বীজ বিস্তারে সহায়তা করে। উজ্জ্বল লাল রঙের ফল লম্ব ভাবে গুচ্ছাকারে মঞ্জরী দন্ডের গায়ে লম্বভাবে সজ্জিত থাকে এবং প্রায় দেড় মিটার অংশ জুড়ে। টাইটান অরামের ফুলের স্থায়ীত্বকাল মোটে দুদিন।

টাইটান অরাম পৃথিবীর বিস্ময়কর বৃহত্তম স্বভোজী যৌগিক অশাখ মঞ্জরী পুষ্প তথা উদ্ভিদ।

লেখক ঃ সতী চক্রবর্তী
৩৯/১ ইন্দ্রানী পার্ক, কলকাতা ৭০০০৩৩
দূরভাষ ঃ ২৪১৭৯৭৫৯ / মোঃ-৯৮৩০৭৪৪৩৪০

হিরোসিমা দিবস

৬ আগষ্ট কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে কাঁচরাপাড়া স্টেশনের সমনে হিরোসিমা আর নয়, নাগাসাকি আর নয়, পরমাণু চুল্লি না, বিকল্প শক্তি চাই — দাবিতে এক প্রচার সভা, প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সকাল ৯ট থেকে ১২টা পর্যন্ত এই প্রচারসভা চলে। পরমাণু চুল্লির বিপদ, তেজস্ক্রিয় দূষণের বিপদ ও ভবিষ্যৎ ও বিকল্প শক্তির সন্ধানে বিষয়গুলি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রচারসভার প্রচারপত্র ও পত্র পত্রিকা সহ স্টলের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিত দাস প্রচার সভায় বলেন পৃথিবীর উন্নত প্রায় সব দেশেই পরমণু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সলে ১১ মার্চ জাপানের ভূমিকম্পের পর পরমণু চুল্লির জাপান বন্ধকরে দিতে বাধ্য হয়। সহ সম্পাদক কিঙ্কল বিশ্বাস জানান হিরোসিমা-নাগাসাকিতে প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা যায়। আহতের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার। এছাড়া বাড়ী ঘর প্রায় ৯২ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। বক্তা আরোও জানান পৃথিবীর পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হচ্ছে। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষেবিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে প্রচার সভায় বলেন পরমাণু বিদ্যুৎ মাত্র ২-৩ শতাংশ অথচ খরচ প্রায় ৩ গুন, রয়েছে মারাত্মক পরিবেশ দূষণ যা পৃথিবীর অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। বক্তা শ্রী দে জানান জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ সহ অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি কাজে লাগানো দরকার। সভায় 'কেন পরমাণু চুল্লি চাই না' শীর্ষক বইটি প্রচার করা হয়।

কোবরা ও ভারত

1 পাতার পর

কোনো রকম দাগ নাও থাকতে পারে। মাথা বা ফনায় পদ্মফুলের মত চিহ্ন থাকলে অথবা পদ্ম বনে থাকলে এদেরকে পদ্মকেউটে নামে ডাকা হয়। জলা জায়গায় এবং ধানের জমির আলে ঘুরে বেড়ায় বলে এদের আল কেউটে নামেও ডাকা হয়। আবার কখনও গায়ের চকচকে কালো রঙের জন্য এবং তীব্র বিষের জন্য মৃত্যু সুনিশ্চিত বলে কালকেউটে নামেও পরিচিত। এদের ফনার নীচে দুধারে একটি করে কালো দাগ থাকতে পারে। পুরুষ কেউটেরা স্ত্রী কেউটের চেয়ে বড় হয়।

স্বভাব ঃ— এরা অত্যন্ত উগ্র বা রাগি। খুব সজাগ, বিপদের সম্ভাবনা বুঝলে ফনা তুলে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে। ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন। অনেক ক্ষেত্রে শত্রুর দিকে বিষ ছুঁড়ে দেয়। এরা মানুষ দেখতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। রাতের শিকরি এরা। ইঁদুর ও ব্যাঙ এদের প্রধান খাদ্য। জলে সাঁতার দিয়ে মাছ ধরতেও পটু বলে 'মেছো আলাচ' নামেও পরিচিত। এছাড়া শামুক, ঝিনুক, গুগলি প্রভৃতিও খায় এরা। এমনকি ছোট ছোট সাপ ধরেও খায় এরা কখনও সখনও। মাছ খায় বলে মাছ ধরার জালে আটকা পড়া মাছ খেতে গিয়ে মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অসংখ্য কেউটে মারা যায় প্রতি বছর।

বসতি ঃ— সাধারণতঃ ধান ক্ষেতে, ঝোপঝাড়, জলাশয়ের ধারে স্যাঁতস্যাঁতে অঞ্চলে বসবাস করে এরা।

বিষের ধরণ ঃ নিউরোটক্সিক। (স্নায়ু তন্ত্রকে আক্রমণ করে)

কামড়ালে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় ঃ—

১) কামড়ের জায়গায় সাধারণত দুটো বিষ দাঁত সহ দুটো উপ বিষ দাঁতের চিহ্নও থাকতে পারে।

২) লসিকা গ্রন্থি গুলো ফুলে ওঠে।

৩) চোখের পাতা বুজে আসে, দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়।

৪) ছোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে।

৫) কথা বলতে অসুবিধা।

৬) ঘুম ঘুম এবং বমি ভাব।

৭) হাঁটা চলা করতে অসুবিধে।

৮) শ্বাস কষ্ট প্যারালিসিস হয়।

৯) শরীর নীলচে রং ধারণ করতে পারে।

১০) জ্ঞানলোপ।

শঙ্খচূড় (King Cobra)

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম বিষাক্ত সাপ এটি। বিজ্ঞানের পরিভাষায় (*Ophiophagus hannah*) নামে পরিচিত এরা। দৈর্ঘ্যে গড়ে ১৬ ফুট কিংবা তারও বেশি হয়। এদের আঁশ পিচ্ছিল ও মসৃণ। মাথা গলার চেয়ে চওড়া। ছাই, কালো, ঘন সবুজাভ জলপাই অথবা হলুদাভ বাদামী বর্ণের হয় এরা। সাদা কিংবা হলুদাভ সাদা 'ক্রসব্যান্ড' থাকে সাধারণত ফনা লম্বাটে এবং অন্যান্য গোখরো বা কেউটেদের চাইতে খানিকটা সরু । 'ক্রসব্যান্ড' টি মাথার দিকে ' ' আকৃতির হয়।

বিস্তৃতি ঃ— ভারতে কর্ণাটক, গোয়া, কেরালা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ (তরাই), বিহার, ওড়িষা, পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বের কিছু রাজ্যে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এদের দেখা যায়।

স্বভাব ও বসতি ঃ— ভারী বর্ষণযুক্ত এলাকাতেই এদের বেশি দেখা যায়। ঘন ক্রান্তীয় বনভূমির ঝরণা, ঝোড়া, বাঁশবন, খাঁড়ীর স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা এদের পছন্দ। তবে আসাম ও দক্ষিণ ভারতের চা-বাগান ঘেঁসা অঞ্চল এদের বসবাসের আদর্শ স্থান।

শান্ত প্রকৃতির দিবাচর সাপ খেকো সাপ। কখনও কখনও গোসাপ জাতীয় প্রাণীও ধরে খায়। জলে ভাল সাঁতার কাটতে পারে আবার গাছেও ভাল চড়তে পারে।

বস্তুত পক্ষেএরাই পৃথিবীর একমাত্র সাপের প্রজাতি যারা অন্যান্য বিষাক্ত সাপ খায়। এদের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য বিষধর যেমন অন্যান্য গোখরো, কেউটে, করেত বা চিতি, শাখা মুটি বা শঙ্খিনী, চন্দ্রবোড়া, গেছোবোড়া ইত্যাদি রয়েছে।

বলাবাহুল্য এরাই পৃথিবীর একমাত্র সাপ যারা পাখিদের মত বাসা তৈরি করতে পারে এবং একমাত্র সাপ যারা এক কামড়ে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতিকে মারার ক্ষমতা রাখে।

বিষের ধরণ ঃ— নিউরোটক্সিক প্রকৃতির তবে এক কামড়ে প্রায় ৭ মিলি বিষ ঢালতে পারে এরা।

গোখরো এবং আমরা

আদিকাল থেকে মানব জীবনে ' গোখরো' জাতীয় সাপই অধিক পরিচিত। মানুষের সাথে এদের সহবস্থানে বহু গল্প গাথা আজও শোনা যায়। বহু ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িত রয়েছে এই সাপেদের সাথেই। আজও প্রধান হিন্দু দেবতা শিবের গলার মালা রূপে গোখ্‌রোকেই মনে করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতেও 'পদ্মনাগ' হিসেবে গোখ্‌রো জাতীয় সাপকেই ধরা হয়। বিভিন্ন সোনালী ও রূপালী সিনেমা ও টিভির পর্দায় গোখ্‌রো জাতীয় সাপকেই সাপেদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয়। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বাৎসরিক 'নাগ' তিথিতে আজও গোখ্‌রো জাতীয় সাপকেই দেবতার পুজো দেওয়া হয়। এখনও ভারতের প্রতিটি অঞ্চলেই গোখরোকে শিবের বাহন হিসেবে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানানো হয়। এই আন্তরিকতা পেয়ে এই সাপও নিজেদেরকে (শঙ্খচূড় বাদে) মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করে। শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ ভারতে এদের মারা নিষিদ্ধ। সেদিক থেকে তুলনামূলক ভাবে কম বিপন্ন। কিন্তু তবুও বিপন্ন কারণ এদের প্রাকৃতিক আবাস স্থল, খাদ্য প্রভৃতির অভাব ঘটছে। ভারতে সাপের দংশনজনিত কারণে মৃত্যুর বেশ কিছু ঘটনার জন্য দায়ী এরা। আবার অপর পক্ষে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণে এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এদের গুরুত্বও অপরিসীম। এরা ভারতের বন্য প্রাণী (সংরক্ষা) আইন ১৯৭২ এর নিয়মে দ্বিতীয় তপশীল ভুক্ত প্রাণী যাদের সংরক্ষা করা প্রতিটি ভারতীয়ের নৈতিক কর্তব্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

১) বাংলার সাপ - ডঃ অসীম কুমার মান্না।

২) সাপ ও দংশন চিকিৎসা - অতীশ দাস ও সৌরভ দাস।

৩) *Snakesh of India - The Field Guid - Romulus Whitaker & Ashok Captain.*

— লেখক ঃ রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব।
মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

সমাজ শিক্ষক উইপোকা

1 পাতার পর

পরিচিত পতঙ্গ 'উইপোকা'।

উইপোকা আইসপ্টেরা গোত্রের অন্তর্গত এদের প্রজাতি সংখ্যা কয়েক হাজার। এদের মত এত বড় পরিবার কেউ গঠন করতে পারে না। সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কিন্তু তবুও দলের মধ্যে ঝগড়াঝাটি, মারপিট, হাঙ্গামা কিছুই হয় না, এরা সবাই দলের হয়েই কাজ করে। দলের স্বার্থে আত্মত্যাগ করে, ভালো মন্দটা নিজের জন্য রাখার মানসিকতাও নেই এদের। ধর্মের বন্ধন বা জারিজুরি এদের লাগে না - মানুষ কেন এমন পারে না।

মানুষ তার নিজের উচ্চতার তুলনায় কতই বা বড় এবং উঁচু বাড়ি বানায়? উইপোকারা বাড়ি বানায় নিজেদের উচ্চতার হাজার গুন বড়, দেখতে যেন চুড়াওয়ালা মন্দির! এর মধ্যে অসংখ্য কুঠুরি, কোনটি রানীর জন্য, কোনটি ডিম রাখার জন্য, কোনটি খাবার রাখার জন্য প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, এরা কেউ অলস নয়, সবাই দক্ষ কারিগর, প্রশস্ত ঘরে বাস করে, প্রয়োজন পড়লেই নতুন নতুন কুঠুরি বানিয়ে নেয়, কখনও মাটির নীচে, কখনও ভিজে জায়গায়, কখনও বাঁশ, কাঠ, খড়কে অবলম্বন করে বাসা বানায়।

উইপোকাদের চোখ নেই, দেখতে পায় না, দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, ভাব বিনময় করতে, শত্রুর মোকাবিলা করতে এক ধরণের মৃদু সৌরভ ছড়ায় যাকে বলে 'ফেরোমন' এটি নির্গত হয় এদের দেহের বিশেষ একটি গ্রন্থি থেকে, বিনা কথায়, বিনা ডাক ব্যবস্থায় এমন অদ্ভুত যোগাযোগ মানুষের কাছে এক বিস্ময়।

এরা খায় কাঠ, খড় - সবাই উদ্ভিজ উপাদান। হজম করতে পারে না বলে একজাতীয় ব্যাকটেরিয়াকে (মানুষেরও এদের লাগে হজম করতে) অন্ত্রে আশ্রয় দেয় - এরাই কাঠ খড়কে ওদের খাদ্য উপযোগী করে তোলে, পরিবর্তে উইপোকাদের অন্ত্রে নিরাপদে বাস করে থাকে। এই সহাবস্থান নীতিও বড় আশ্চর্যের। দলের মধ্যে চার শ্রেণীর উইপোকা থাকে - পুরুষ, রানী, কর্মী ও রক্ষা। পুরুষ ও রানীর পাখনা থাকে, কর্মী ও রক্ষাদের থাকে না, একমাত্র রানী ডিম পাড়তে পারে। একটি রানী সারা জীবনে ১০ লক্ষের মত ডিম পারতে পারে। এদের আত্মরক্ষার কৌশলটিও ভারি চমৎকার, কেউ কামড়ে দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করে, কোন প্রজাতির মাথায় থাকে ধারালো এক উপাঙ্গ, আবার কোন প্রজাতি শত্রুর দিকে বিষাক্ত এক ধরণের তরল ছুঁড়ে মারে।

এদের আবির্ভাব ঘটেছিল 'ইওসিন' যুগ অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭ কোটি বছর আগে। বিবর্তনের পথ ধরে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে, আজকের এই পরিচিত পতঙ্গটি। এদের আমরা ক্ষতিকর পতঙ্গ রূপেই গন্য করে থাকি। ক্ষতি করলেও উপকারও যে কিছু করে না, এমন নয়, কাঠ খড় প্রভৃতি উপাদানকে যৌগিক পদার্থে রূপান্তরিত করে ফিরিয়ে দেয় প্রকৃতিরই বুকে এবং উদ্ভিদের বংশবিস্তারের পথকে সুগম করে।

উইপোকারা মাঝে মাঝে গর্ত ছেড়ে বেড়িয়ে এসে আকাশে উড়তে থাকে জৈবিক তাড়নায়। আকাশে রানীরা পুরুষ সঙ্গীকে নির্বাচন করে। এই সময়ই অধিকাংশ পোকারা পাখীদের পেটে যায়, জলে কাদায় প্রাণ হারায়, কেউবা পতঙ্গভুকদের শিকার হয়। নির্বাচন শেষে যারা বেঁচে থাকে, তারা বাসায় ফিরে আসে, ডিম পাড়ার সময় হলে রানী উইপোকার দেহের আয়তন বেড়ে যায়। প্রথমে রানী কর্মী ও রক্ষীর জন্ম দেয় ও পরে জন্ম নেয় পক্ষধারী পুরুষ ও রানী।

উইপোকদের জীবন খুবই সাদামাটা, পতঙ্গ হলেও স্বভাবে এরা খুবই উদার। রানীর আদেশে কর্মী ও রক্ষীরা কাজ করে রানী ঝগড়াটে নয়, পতিপ্রেমে রানীর জুড়ি নেই, বাসায় নতুন রানী এলেও প্রতিবাদ করে না। নতুন রানীও ঐ বাসায় ডিম পাড়ে ও বংশবিস্তার করে। রক্ষী ও কর্মীরা বৃদ্ধ রাজা ও রানীকে তাদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সযত্নে প্রতিপালন করে। অধুনা মনুষ্য সমাজে, বৃদ্ধ বাবা মায়েদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবার মানসিকতা (আমেরিকান দর্শণ ও জীবনচর্চার ভ্রষ্ট অনুকরণ) থাকে কিন্তু এরা বৃদ্ধ বাবা মায়ের প্রতি কর্তব্যের কথা কখনও ভুলে যায় না এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দলের হয়েই কাজ করে। ডিম পাড়তে অক্ষম হয়ে গেলে রানীকে তাড়িয়েও দেয় না। উইপোকাদের এই কর্তব্যপরায়নতা থেকে মনুষ্য সমাজকে লজ্জা থেকে রেহাই পেতে শিখতে হবে। এরা কি মানুষের কাছে এই প্রশ্ন রাখতে পারে না, যে— "তোমরা প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠতর জীব হতে পারো কিন্তু আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নয়।"

রচনার শেষে জানাতে চাই এদের জন্য, রচনাটির প্রারম্ভে উল্লেখিত 'কবিতাটি' যতটা কৌতুক সঞ্চার করে। এদের জীবনচর্চা কিন্তু ততখানি হেয় করার নয়। এদের জীবন যাত্রা মনুষ্য সমাজকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা রাখে। অবিজ্ঞের মত এদের কীটনাশক দিয়ে বিনাশ করতে গিয়ে আমরা বরং পরিবেশের ভয়ংকর সর্বনাশ করছি।

তথ্য সূত্র ঃ ১) পতঙ্গ রাজ্যের অভিনব রূপকথা — সুধাংশু পাত্র।

২) জীববিজ্ঞন — চৌধুরী, সাঁতরা।

৩) বংশগতি ও অভিযোজন — সাঁতরা।

লেখিকা ঃ পারুল দাস,

অতিথি লেকচারার, ডঃ বি আর আম্বেদকর কলেজ, কুলতলি, জয়নগর, মতিলালপাড়া, পোঃ জয়নগর - মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩৭। মোঃ- ৯৭৭৫৮৮৫৬৬

পাখিদের কথা

1 পাতার পর

পুরুষ আলাদা করা কঠিন। তবে পুরুষটির মথা এবং ঠোঁট সামান্য মোটা।

স্বভাব ঃ- সাধারণত চার-পাঁচটি (তার বেশীও হতে পারে) পাখি দলবদ্ধ ভাবে থাকে। কখনও চাষের মাঠে অথবা ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে একসঙ্গে খাবার সংগ্রহ করে।

খাদ্য ঃ- প্রধানত ঘাসের বীজ। তবে পুরুলিয়াতে জলাধারের পাশে ভেজা পাথরের ওপর থেকে ওদের 'অ্যালগি' খেতে দেখেছি।

ডাক ঃ- অনেকটা চড়ুইয়ের মত (ব্রিক –ব্রিক) তবে খুব মিহি স্বরে ডাকে।

বাসা ঃ- শুখনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে গোলকাকার এবং মধ্যিখানে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে। নীচু গাছের ডালে পাতার আড়ালে বা ঘন ঝোপের মধ্যে বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধার সময় কার্যত সারা বছর তবে আমাদের গ্রামে মার্চের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বাসা বাঁধতে দেখেছি। মজার কথা হল বাচ্চারা বড় হয়ে গেলেও বাসাটির ভেতরে মা-বাবার সাথে বেশ কিছুদিন থাকে, এবং বাসাটিকে সকলে মিলে ডর্মিটরির মত ব্যবহার করে।

বাসস্থান ঃ- পশ্চিমবঙ্গ সহ দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র, আন্দামান এবং ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ চীন, তাইওয়ান, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

লেখক ঃ সম্রাট সরকার, ফোন ঃ- ৯৪৩৩৯৬২২২৭

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কেন প্রাসঙ্গিক

কয়েকদিন আগে মুম্বাইতে প্রবল বর্ষণে সারা মুম্বাই জলমগ্ন হয়ে পরে। মুম্বাই আমাদের দেশের বাণিজ্যনগরী এখানে মূলত বিত্তশালী মানুষের বাস। বসবাসের ব্যয় অত্যন্ত উচ্চ। বহু টাকা দিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন মানুষের। সভ্যতার সমস্ত সুবিধা পেয়ে থাকা মানুষদের এখন বিপদ সভ্যতার সংকট।

মুম্বাই এর চান্দিভ্যালিতে আমার এক অর্থনৈতিক কৃতি আত্মীয় থাকেন। চোদ্দ তলার একটি ১০ হাজার বর্গফুট ফ্ল্যাটে তাঁদের বসবাস। স্বামী এবং স্ত্রীর দু দুটো গাড়ি একটা পার্টিতে যাওয়ার জন্য একটা আর একটা অফিসে যাওয়ার অর্থনৈতিক সমস্ত সুবিধা তাদের আছে। কিন্তু তাদের বর্তমান সমস্যা বড় বড় গেছো ইঁদুর। এয়ার কন্ডিশন মেশিনের তার, গিজারের তার, কেবিল, নেটের তার তারা কেটে দিচ্ছে। এমনকি মাটির তলা থেকে বেড়িয়ে পাইপ বেয়ে ১৪ তলায় উঠে ফ্রিজ খুলে খাবার খাচ্ছে। ফাঁক পেলে ৬ মাসের যে শিশুটির বিছানায় তার পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকছে। মুম্বাইতে বহু মানুষ ইঁদুরের কামড়ে আক্রান্ত হয় এবং তাদের হাসপাতালে যেতে হয়। আমার আত্মীয়ের বক্তব্য কাকে রিপোর্ট করব? ধর্মীয় কারণে মুম্বাইতে ইঁদুর মারা যায় না 'গণপতি বাপ্পা মরিয়া' বললেও ইঁদুর যায় না। কি করি ভেবে পচ্ছি না। শেষে মাউসট্রাপ ও কেটে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছে ইঁদুরের দল।

এছাড়া ঈশ্বরের অভিশাপ 'প্লেগ' আবার কি ফিরে আসবে মুম্বাইতে! প্লেগ এক ধরণের জীবাণু ঘটিত রোগ। জীবাণুটির নাম ইয়েরসিনিয়া পেস্টিট। আগে বলা হত পষ্টুরেলা পেস্টিট। এই রোগটি প্রাথমিক ভাবে ইঁদুরের হয়। তারপর এই রোগটা মানুষের মধ্যে ছড়ায় নীলমাছি।

বর্তমানে এই ধরণের কীটপতঙ্গ নিয়ে খুব উচ্চপর্যায়ের গবেষণা হলেও তা বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের সরল বিজ্ঞান লেখনির কাছেম্লান। এধরণের আন্তরিক গবেষণা বর্তমান বিজ্ঞান গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে প্রায় ১৫০ জন মানুষ জাপানি এনকেফেলাইটিসে মারা গেছেন উত্তরবঙ্গে। এর জীবাণুর নাম জাপানি এনকেফেলাইটিস ফ্লাভি ভাইরাস। জীবানুর বাহক মূলত কিউলেক্স ভিসানোয়াই মশা সহ এই প্রজাতির অন্য কয়েকটি মশা। পরিযায়ী পাখি ও শুয়োরের শরীর থেকে জীবাণু বহন করে সংক্রমন ঘটায় মানব শরীরে মশারা। এই মশার জন্ম ধান ক্ষেতে।

কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, আরশোলা, মশা, ছারপোকা নিয়ে সহজ ভাবে বিজ্ঞান গবেষণার কাজ করার জন্য চাই মাটির কাছে থাকা গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের মত বিজ্ঞানীদের। আসলে এই বিশ্বায়নের বাজারে সমস্ত বিষয়ই পণ্যায়িত। তাই এই ধরণের গবেষণা তখনই দরকার হয় যখন মানুষ মারা যেতে থাকেন। কার্য ও কারণ মেলানোর মত প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞানীর বড়ই অভাব। তাই আজকের সভা (১ আগষ্ট বিজ্ঞান সাধক প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের ১১৯ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠন পলাশি দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলে)যে অসাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

— লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১ আগষ্ট ২০১৪ বিজ্ঞান সাধক প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের ১১৯ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠন পলাশি আচার্য্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করা হল। যৌথ ভাবে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি, কলকাতা এই অনুষ্ঠনের আয়োজন করে। সহযোগিতায় পলাশি আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাই স্কুল। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কর্ম ও জীবন ঃ গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৪টি স্কুলের ৭ম ও ৮ম শ্রেণির ৭৫ জন ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শিক্ষক হিরন্ময় মাইতি, বিজ্ঞান লেখক ও গবেষক দীপক কুমার দাঁ ও বির্বতন ভট্টাচার্য বিজ্ঞানীর কর্ম ও জীবন নিয়ে নানা তথ্য আলোচনা করেন। পলাশি দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস স্কুলের প্রাপ্তিকর, রিয়া পাল ও পিয়ালী দাস এবং হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের সঞ্চয়িতা দে এবং চাঁদমারী নগেন্দ্রবালা বালিকা বিদ্যালয়ের রেলিনা দে বিশেষ পুরস্কার পান। নবম ও দশম শ্রেণির ১৪টি বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০ ছাত্রী কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পাখি, পোকামাকড়, গাছপালা জীবজন্তু ও সাপ বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। খুবই আগ্রহের সঙ্গে ছাত্রীরা এই কুইজে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠনটি পরিচালনা করেন বিজ্ঞান দরবারের সম্পাদক সুরজিত দাস, সহ সম্পাদক কিঞ্জল বিশ্বাস ও সদস্যা স্বাগতা সরকার। প্রতিটি স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে ১টি কুইজের দল তৈরী করা হয়। দলগত ভাবে চাঁদমারী নগেন্দ্রবালা বালিকা বিদ্যালয়, বড় জাগুলি রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপিঠ ও হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার পান। বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও বন্য প্রাণী পত্রিকা ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, শংসাপত্রও দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের হলঘরে পাখি, প্রজাপতি, পরিবেশ ও জলাশয় নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনী পরিচালনা করেন পরিবেশ কর্মী ও গবেষক সম্রাট সরকার, সুরজিৎ ভদ্র রায় ও সৌরভ মুখার্জী প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকেই আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখিয়ে ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণির সকল ছাত্রীরা বিভিন্ন প্রদর্শনী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখেন। প্রতিটি আলোচনা সভা মনোজ্ঞ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠনে প্রকৃতি বিজ্ঞানীর কর্ম ও জীবন নিয়ে আলোকচিত্র সহ বক্তব্য রাখেন গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানী দীপক কুমার দাঁ, প্রজাপতির কথা নিয়ে ছবি দেখিয়ে বক্তব্য রাখেন সুরজিৎ ভদ্র রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ডঃ গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, প্রধান শিক্ষিকা ডঃ মাধবী ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মায়া ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী, সমিতির পক্ষেমালা চক্রবর্তী ও কালান্তরের প্রকৃতি ও মানুষের সম্পাদক ডঃ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষে জয়দেব দে সহ আরো অনেক গুণী মানুষ।

চলে গেলেন ভারততত্ত্ববিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত লেখিকা, বিখ্যাত অধ্যাপিকা, মননশীল গবেষক, পুরানবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য ৯২ বছর বয়সে এস এস কে এম হাসপাতালে প্রয়াত হলেন ২৪ মে, ২০১৪তে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য তিনি মরনোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁর মরদেহ গ্রহণ করে আর জি কর মেডিকেল কলেজ।

মেদিনীপুরের এক খ্রিষ্টান পরিবারে সুকুমারীর জন্ম ১৯২১-এর ১২ জুলাই। তাঁর উচ্চতর বিদ্যার্জনের বিন্যাস ঘটেছিল প্রধানত দুটো ভাষাকে কেন্দ্র করে। ইংরেজি ও সংস্কৃত। ১৯৪৪ সালে ইংরেজিতে এম এ করেন। সংস্কৃতে স্নাতক হতে চাইলেন তিনি। খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত হওয়ায় তাঁর এ চাওয়া এই সময়ে অপূর্ণ থেকে যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। তবে প্রাইভেটে সংস্কৃতে এম এ করে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন ১০ বছর পরে।

ইংরেজি ও সংস্কৃত, দুটো ভাষাতেই তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তাঁর কর্ম ও কলমে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। কর্মজীবনের শুরুর প্রথম ১০ বছর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। ১৯৫৭ থেকে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়াতে শুরু করেন। তুলনামূলক সাহিত্য, পরে একাদিক্রমে আঠাশ বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। সুপরিচিত ও মৌলিক ভাবনার পত্রপত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলায় প্রায় দুই শতাধিক প্রবন্ধলিখেছেন তিনি। বহু জ্ঞানগর্ভ এবং মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। অধ্যাপনার জীবন থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন ১৯৮৬ সালে।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখনী কতিপয় ভাবনাসূত্রকে মৌলিকতার মোড়কে এগিয়ে নিয়েছেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বিবর্তন ও বিকাশের সূত্র নির্দেশ করেছেন তিনি। কার্যকারণ ভিত্তিক যুক্তিবাদ ছাড়া আপ্তবাক্যে তাঁর আদৌ কোনো মান্যতা ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমুদয় ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বস্তুনিষ্ঠব্যাখ্যা বিশ্লেষনের একটা ধারাবাহিকতা তৈরি করে গেছেন। তাঁর লেখালেখির বাঁকগুলো আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে। নরীচেতনার উল্লেখ ও নারী প্রজাতির প্রেক্ষিতটা ধর্ম ধারণার সংশ্লিষ্টতায় ধরতে চেয়েছেন। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা গিয়ে তাঁর মৌলিক ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি। বেদজ্ঞ হিসেবে বেদচর্চায় তিনি ছিলেন নিরলস। বেদের যুগেই বেদবিরোধী পন্ডিতবর্গের কথা লিখেছেন তিনি। তাঁরাই বেদের প্রামান্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ব্রহ্মচিন্তা, যজ্ঞকথা, পরলোকচর্চা থেকে সেই সময়ের ঋষিরা সরে এসেছিলেন লোকায়ত দর্শণের আঙ্গিনায়। ওঁদের ছিল প্রশ্ন, প্রত্যয়, সংশয় এবং কোথাও স্পষ্ট নাস্তিক্য। খ্রিষ্টপূর্ব ১২ শতক থেকে খ্রিষ্টিয় ৫-৬ শতক পর্যন্ত ১৫০০ বছরের বেদ কেন্দ্রিক সাহিত্যের ইতিহাস তাঁরই রচনা। বৈদিক সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্যায়নও করেছেন তিনি। বেদকে তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রেখে বস্তুগত বিশ্লেষণও তাঁর অন্যতম মৌলিক কাজ। তাঁর উল্লেখযোগ্য কতিপয় গ্রন্থ হল বেদের সংসশয় ও নাস্তিক্য, বেদে ক্ষুধা ও খাদ্য, নিয়তিবাদ ঃ উদ্ভব ও বিকাশ, ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য, প্রাচীন ভারত, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, দি ইন্ডিয়ান থিয়গনি, বুটিষ্ট হাইব্রিড, স্যাংস্ক্রিট লিটরেচর, দি গীতা-ইটস্ হোয়াই এন্ডহাউ প্রভৃতি।

সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের বঙ্গানুবাদের জন্য সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৪তে। ১৯৮৮ সালে আনন্দ পুরস্কার এবং ১৯৯৪ সালে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার সম্মানিত হন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন পুরস্কারও তিনি পান ১৯৯৪তে।

লেখক ঃ সুরেশ কুন্ডু, ফোন ঃ ৯০৩৮৭০৩৩৭০

কল্যাণী ও গয়েশপুরে
বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও পদযাত্রা

১৫ অগষ্ট কল্যাণী কম্পিউটার স্বাক্ষরতা মিশনের উদ্যোগে কল্যাণী স্টেশন থেকে বেদীভবন চাঁদামারী দেশপ্রিয় শিক্ষায়তন পর্যন্ত এক পদযাত্রার মাধ্যমে বেশ কিছু বৃক্ষরোপন করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন করেন গয়েশপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল চক্রবর্তী। দেশপ্রিয় শিক্ষায়তন স্কুলে সারাদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান দরবরের পরিচালনায় প্রদর্শনীতে অলৌকিক নয় লৌকিক প্রদর্শনীর ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। খাদ্যে ভেজাল ধরবেন হাতে কলমে কিভাবে এবং পোষ্টার সহ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা খাদ্যে বিভিন্ন ভেজাল পরীক্ষা হাতে কলমে করে দেখান। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যা করেন। বিজ্ঞান অন্বেষক সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক বই পত্র পত্রিকায় প্রদর্শনী ও স্টলের আয়োজন করা হয়। 'বিকল্প শক্তিই সৌরশক্তি' শীর্ষক স্টলের আয়োজন করা হয়। সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে সাপ সম্পর্কে সচেতনতা প্রসারের জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরিবেশ কর্মী চন্দন কেলেমনসিং সাপ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রদর্শনীতে বিজ্ঞান কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন।

কলকাতায় হিরোসিমা দিবস

৬ আগষ্ট কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে দুপুর ২টো থেকে 'হিরোসিমা থেকে গাজা' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ সভা আয়োজন করে 'দৃশ্যান্তর' নাট্য গোষ্ঠী। যৌথ ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা অংশগ্রহণ করে। চেনা আধুলি, কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, হেতুবাদী, সংবাদ মন্থন যুব ভারত, বিকল্প সহ বিভিন্ন সংস্থা অংশ গ্রহণ করেন। নাটক, গান, ছবি, পোস্টার প্রদর্শনী, গিটার র‍্যালি, পত্র পত্রিকা স্টল সহ হিরোসিমা দিবসে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ কলেজ স্কোয়ারে বেশ জমে ওঠে। পথ চলতি বহু মানুষই আগ্রহের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা স্টলের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞানমনষ্কতা

'সব কিছুতেই খুঁজব কারণ
অন্ধ ভাবে মানব না,
বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায়
বন্দি করে রাখব না।'

অভূতপূর্ব বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ যখন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে তখনও আমাদের মনে অন্ধ বিশ্বাস ও অলৌকিকতার প্রতি প্রশ্নহীন অনুবর্তন সমানে চলছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাব জন্ম দেয় নিজের ওপর অবিশ্বাস। এর ফলেই সে হয়ে পরে অতীন্দ্রিয় ও দৈবের ওপর নির্ভরশীল। আর এরজন্য দায়ী আমাদের নিজেদেরই তৈরি সমাজ ব্যবস্থা। নানারকম কাল্পনিক, অস্তিত্বহীন, বুজরুকি গল্পের সাহায্যে হাজার হাজার শিশুর মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কতগুলি মিথ্যা ধারণা ও ভিত্তিহীন সংস্কার। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক করার বদলে তাদের অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় অভ্যস্ত করে তোলা হয়।.পরবর্তীকালে এই অসম্পূর্ণ জ্ঞান সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মানসিকতাকে করে রাখে অথর্ব ও নিস্ক্রিয়। তাই এক শালিক, দু-শালিক, টিকটিকি বলে ঠিক্‌ঠিক্, অপয়া তেরো, বেড়াল কাটে রাস্তা, গণেশের দুধ খাওয়া, রোগ মারাতে মাটি খাওয়া, আরব সাগরের জল পান ইত্যাদি নানা বিশ্বাস ও সংস্কারে ডুবে থাকে। আশৈশব লালিত এইসব ধোয়াটে ধারণাগুলি পরিণত বয়সেও কাটতে চায় না। এরফলে তারা হারিয়ে ফেলে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের সঠিক পথ খোঁজার ক্ষমতা।

বিজ্ঞান মানুষকে দেয় যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা। অন্ধের মত কোন কিছু মেনে নেওয়াকে সে প্রশ্রয় দেয় না। বিজ্ঞানে অভ্রান্ত বলে কিছু নেই। আজ যা অভ্রান্ত বলে প্রতীত, নবতম আবিষ্কারের ফলে কাল তা ভ্রান্ত হতে পারে। তাই বলা যায় মানুষ যুক্তিবাদী।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে এই সাইবার যুগে দাঁড়িয়েও আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করছি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, জ্যোতিষীদের ভাগ্য গণনা, গ্রহরত্ন ধারণ প্রভৃতির প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ। যেখানে আছে যুক্তি ও বিচারের পরিবর্তে অন্ধ আনুগত্য।

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তৎপরবর্তীকলেও যাঁরা বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞনের আলোকে সমাজের উত্তরণ চেয়েছিলেন তাঁরাই কখনও বেদান্তের ভ্রান্ত ধরণা কখনও মুর্খ পন্ডিতদের অলীক বিজ্ঞান আশ্রিত কুসংস্কারের প্রভাব থেকে নিজের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেননি। শুধু আমাদের দেশেই নয়। পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই বিজ্ঞান থেকে ঈশ্বর বিশ্বাসে দিকে আস্থাশীল ছিলেন।

বিজ্ঞান না জানলে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না এ ধারণা ভুল। বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনচর্চা কোনো অনুশীলনের ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য প্রয়োজন উপলব্ধি বা সম্যক ধারণা। কোনো প্রচলিত ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করার আগে তার কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। নতুবা কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য আর কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় তা বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য। মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা শুধু বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। সমাজের উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষেরাও এ কাজটি করতে পারেন। তবে তার আগে প্রয়োজন তাদের নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বরা তো আছেনই এমনকি অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরাও আছেন যাঁরা বেদান্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র বা প্রচলিত ধ্যানধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অবাক লাগে যখন দেখি ভবিষ্যতে রোগ, দুঃখ ও দূর্ঘটনাকে এড়াবার জন্যে এবং সুখে শান্তিতে থাকার জন্যে এক শ্রেণীর সাবধানী মানুষ আগাম সতর্কতা হিসাবে তাগা, তাবিজ, কবচ, মাদুলি, আংটি প্রভৃতি ধারণ করেন, নিয়মিত চোখ রাখেন দৈনিক সপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলের প্রতি।

অজানার প্রতি মনুষের ভয় আদিকালেও ছিল এখনও আছে। তাই আমরা আজও কুষ্ঠিবিচার বা হস্তরেখা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতকে জানার জন্য জ্যোতিষের দ্বারস্থ হই। আসলে দুর্বল মন এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব মানুষকে অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল করে তেলে।

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা অজ্ঞানতা ও আর্থিক দুরবস্থা। যতদিন না সমাজ প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হচ্ছে, যতদিন না দারিদ্র থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততদিন আপামর দেশবাসীকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা সম্ভব নয়। তবে কি অর্থনৈতিকভবে অগ্রসর দেশগুলিতে বিজ্ঞানবিরোধিতা বা কুসংস্কারের কোনো ছাপ নেই? তবে তার মাত্রা অনেক কম এবং অন্যপ্রকার।

সবশেষে বলি, বিজ্ঞানমনস্ক জীবনচর্চা করতে হলে চারপাশে প্রতিদিন যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। কমাতে হবে ঈশ্বর এবং অলৌকিক শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। বানাতে হবে সচেতনতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় চরমসত্য মানুষের মধ্যেই নিহিত থাকে।

লেখক ঃ কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭/এ, সেন্ট্রাল রোড, ফ্লাট ৩এ, যাদবপুর, কলকাতা-৩২, ফোন ঃ ৯৪৩৩১৪৫১১২

বিজ্ঞানের মজা কর্মশালা

১২ অগষ্ট বিজ্ঞান দরবারের পরিচালনায় কল্যাণী কম্পিউটার স্বাক্ষরতা মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের 'বিজ্ঞানের মজা' শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করে সংস্থার পক্ষে তাপস পান্ডেবলেন ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনষ্কতা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানের মজা কর্মশালার আয়োজন কর হয়েছে। বিজ্ঞান দরবারের সহ সম্পাদক কিঞ্জল বিশ্বাস ছাত্র-ছাত্রীদের হতে কলমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজা (আগুন ছাড়া যজ্ঞ, নাড়ী বন্ধ , ওজন তোলা, মদ থেকে জল) প্রভৃতি দেখিয়ে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালায় সাপ নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সাপ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর সহ আলোচনা করেন বিজ্ঞান কর্মী জয়দেব দে। ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ আগ্রহের সঙ্গে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের কলম

কর্ম ও জীবন ঃ বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

(বিজ্ঞান সাধক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের ১১৯ তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন (০১-০৮-২০১৪) অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সেরা প্রবন্ধ লেখার পুরস্কার পেয়েছেন পলাশী আচার্য্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী প্রাপ্তি কর। এই প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় ছাপা হল—সম্পাদক)

জন্ম ও পরিচয় ঃ প্রয়াত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার লোনসিংহ গ্রামে ১ আগষ্ট ১৮৭৫ সালে। বাবা অম্বিকাচরণ, মা শশীমুখী দেবী। বাবা ছিলেন গ্রামের দরিদ্র পুরোহিত।

প্রাথমিক জীবন ঃ মাত্র ৫ বছর বয়সে তাঁর বাবার অকাল মৃত্যু ঘটে। ফলে জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্রকে ঐ বয়সেই পরিবারের ভার গ্রহণ করতে হয়। মেধাবী গোপালচন্দ্রের শৈশব তাই সুখের ছিল না। খেলাধুলাতেও মন ছিল না। একমাত্র পুকুরে স্নান ছাড়া তাঁর সংগ্রামময় জীবনে খুব একা হয়ে যেতেন। প্রকৃতির বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে বিরাট জগতের মুখোমুখি দাঁড়াতেন। প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সখ্যতা। প্রকৃতির কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন আসল শিক্ষা। অনুসন্ধিৎসু হওয়ার শিক্ষ, ভয় ও কুসংস্কারের উর্দ্ধে ওঠার শিক্ষ, প্রকৃতির মতো মূক হওয়ার শিক্ষ।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা (১৯১৩-১৯) ঃ তবে সুখের বিষয় লোনসিংহ হাইস্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি ময়মন সিংহের আনন্দমোহন কলেজে আই এ তে ভর্তি হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম বিভগে প্রথম স্থান অধিকার সত্ত্বেও তাঁর পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখেই গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯১৫ সালে। এই সময় তাঁর বৈবাহিক কার্য সুসম্পন্ন হয়।

কর্মজীবন ঃ অত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পুরোহিতের সন্তান গোপালচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় যজমানীতে। পরে লোনসিংহ হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলের বাগানে ছাত্রদের নিয়ে গিয়ে সাধ্যমতো পরীক্ষাদি করতেন। এক বর্ষার রাত্রে ভৌতিক আলোর রহস্য খুঁজতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন এক আশর্চ্য প্রাকৃতিক আলো। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুও এই অজ্ঞাত, অখ্যাত লোকটির প্রতি কৌতুহলী হয়ে পড়েন। সেই সময়ের হিন্দু সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য 'কমলকুটি'র নামে সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কাশীপুরের এক অফিসে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি নেন তিনি। ঘটনাক্রমে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে খুঁজে বের করেন এবং ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' এ সাদরে ডেকে নেন। গবেষকের বৃত্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও পরে বেছে নিলেন কীট পতঙ্গ, জৈবদ্যুতি এবং শেষ পর্বে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ এ রূপান্তরে পেনিসিলিন এর ভূমিকা। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে তাঁর ১৪টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্রের প্রমাণিত খাদ্য নির্ভর বা ট্রাফিক থিয়রী Transaction of Bose Institute পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর পিঁপড়ে নিয়ে গবেষণা ইংল্যান্ড, জার্মান ও আমেরিকায় প্রচারিত হয়নি। ফলে বিশ্বের দরবারে তাঁর এই কীর্তি অজানাই রয়ে গেলো। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' এর মুখপত্র হিসেবে প্রচারিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটির পরিচালনভার প্রথম থেকেই তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। বড়োদের জন্য বিভিন্ন গবেষণামূলক লেখার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও 'ছোটদের পাতা' গ্রন্থটি আকর্ষনীয় ভাবে পূরণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিভাষা কমিটির সদস্য হিসেবে পরিভাষা প্রণয়ন করেন তিনি।

স্বীকৃতি ও সম্পাদনা ঃ ১৯৫১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক কীটপতঙ্গ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ পান। ১৯৬৮ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭৫ সালে রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পান। ১৯৮০ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডি এস সি প্রদান করা হয় তাঁকে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ 'বিজ্ঞান অমনিবাস', 'মহাশূন্যের রহস্য', 'আণবিক বোমা', 'স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু', 'করে দেখো (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড)', বাংলার মাকড়সা', বাংলার কীটপতঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং লেখা পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষ পর্ষদের সঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি ছাত্রপাঠ্য 'জীববিজ্ঞান' গ্রন্থটি তাঁর লেখা।

মৃত্যু ঃ এই মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয় ৪ এপ্রিল ১৯৮১ সালে।

উপসংহার ঃ বিজ্ঞান যে একটা শুষ্ক বিষয় নয় তার মধ্যেও যে আনন্দ আর রস আছে সেই রসবোধের প্রকাশ তাঁর প্রতিটি লেখায় ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ। পরিশেষে জানাই যে তাঁর জীবনদর্শণকে পাথেয় করে প্রতিটি শিশু-কিশোর ও মানুষকে যদি আমরা উদ্দীপিত করতে পারি এবং আমৃত্যু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তা যদি সত্যি করতে পারি তবেই তাঁকে যথার্থ সম্মান দেখনো হবে।

লেখিকা ঃ প্রাপ্তি কর, সপ্তম শ্রেণী, বিভাগ-খ, রোল-১, পলাশী আচার্য দুর্গা প্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com